ঝরা ফুলের সৌরভ

মহসীন চৌধুরী জয়

সুকুন পাবলিশিং

গল্পক্রম

মৃত্যুঞ্জয়..... ১৫
চিরন্তন..... ২৬
রক্ত দিয়ে লেখা..... ৩৭
নাফিসাচরিত..... ৪৮
শহিদ রাব্বি..... ৬১
বেওয়ারিশ..... ৭৩
ঝরা ফুলের সৌরভ..... ৮২

মুখবন্ধ

একজন আন্দোলনকারীর চোখে রাইফেল ঠেকিয়ে গুলি চালাল পুলিশ। নিভে গেল জীবন প্রদীপ। মাথায় হেলমেট পরে চাপাতি দিয়ে এলোপাথাড়ি কোপাল ফ্যাসিস্ট কর্মী। ঝরল রক্ত, ক্ষরণ হলো জীবনের। ৫ আগস্ট যাত্রাবাড়িতে চলল গুলির মিছিল। একদল মানুষ আরেকদল মানুষকে নারকীয় নৃত্যে, পৈশাচিক আনন্দে হত্যায় মেতে উঠল। এই যে দানবীয় আক্রোশ, সভ্যজগতে এর স্থান কোথায়?

প্রাগৈতিহাসিক যুগে অধিকাংশ মানুষ ছিল পশুতুল্য। আগুনসভ্যতা তখনো মানুষকে আলোকিত করেনি। মানুষ পশুর মতো কাঁচা মাংস খেতো, কোনো কোনো মানুষ রক্তও খেতো। গাছের ছালবাকল ও পশুচামড়া পরিধান করত। খাদ্য ও বাসস্থানের জন্য পশুর সাথে করত প্রতিনিয়ত লড়াই। মূলত আগুনের ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মানুষ সভ্যতার পথে আসে। একসময় উত্তম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে পশুদের খাঁচায়ও বন্দি করে। অতঃপর পশুদের পৃথিবী দখল করে নেয় মানুষ।

আধুনিক সভ্যতায় এসে মানুষের চাহিদা ও রুচির পরিবর্তন হয় সংস্কৃতির মায়াজালে। লোভ লালসা ও ষড়রিপুর ধোঁকায় এখন মানুষই রীতিমতো পশু। জন্তু জানোয়ার এখন মানুষকে ক্ষতি করতে পারে না। মানুষের জন্য এখন মানুষই ক্ষতির কারণ, মৃত্যুময় আতঙ্ক। অসভ্য এ

সকল মানুষ অপর মানুষের বাড়িতে ডাকাতি করত। মানুষ হত্যা করত। এর ধারাবাহিকতায় একদল দেশটাকেই ডাকাতি করে ফেলল নজিরবিহীন লুটপাটের মাধ্যমে।

জনগণকে যেখানে সর্বোচ্চ মূল্য দিয়ে গণতান্ত্রিক সরকার বলা হচ্ছে সেখানে জনগণের ভোটাধিকারই হরণ করল। এ সমাজকে আমরা বলব সভ্য সমাজ? এ সমাজকে কি সভ্য বলা যায়! তারা নিজেদের লোকদের অবৈধ সুবিধা দেওয়ার জন্য রীতিমতো বৈষম্যের একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা করে ফেলল। অথচ ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ প্রধানত বৈষম্যের বিরুদ্ধেই হয়েছিল।

জুলাই ২০২৪ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন একটা পর্যায়ে সরকার পতন আন্দোলনে রূপ নেয়। জনবিচ্ছিন্ন ছিল এই অবৈধ সরকার, তবু তাদের হটানো ছিল কঠিনতর এক প্রতিজ্ঞা। কত তরুণ যুবক হাসতে হাসতে প্রাণ দিয়ে দিলো যৌক্তিক আন্দোলনকে সমর্থন করে। কত শিশু ও নারী শহিদ হলো দেশকে ভালোবেসে। এই নির্মমতার ছবি, পাশাপাশি বীরত্বের কাহিনি ইতিহাস যেন ভুলে না যায়। শহিদের আত্মদানের গল্প আমাদের প্রত্যেকের জীবনকে নৈতিকভাবে দায়িত্বশীল করুক সুন্দর বাংলাদেশ বিনির্মাণে।

আমি বারবার বলি লেখক মূলত নিজেকেই লিখেন। আন্দোলনে আমার সক্রিয় অংশগ্রহণ গল্পের জীবনকে জীবনের গল্প হিসেবে আঁকতে সাহায্য করেছে। এই গল্পগাঁথায় কারও কারও কথা চির কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করা দরকার। সহযোগিতার সৌন্দর্যে জুয়েল রানার নাম সর্বাগ্রে। বন্ধু গোপাল কর্মকার, মামুন রশিদ, বন্ধুপ্রতিম মোহাম্মদ রায়হান খান, অনুজ জামান প্রধান, আল-আমিন, আল ইমরান, খাইরুল ইসলাম প্রত্যেকেই যার যার জায়গা থেকে গল্পপাঠ ও প্রতিক্রিয়ায় আমাকে উজ্জীবিত করেছে। গোপালের দোকানে আড্ডা এবং ইয়াসিনের চায়ের

দোকানে রাতের পর রাত ইয়াসিনসহ জুয়েল ও সুজনের সাথে আমার আড্ডাও গল্পে রসদ জুগিয়েছে নিঃসন্দেহে।

আমার বন্ধুদের মধ্যে সবচেয়ে মেধাবী ছাত্রটি আজ আমার প্রকাশক। সুকুন পাবলিশিং-এর স্বত্বাধিকারী বিল্লাল হোসেনকে ধন্যবাদ আগ্রহ নিয়ে আমার বই প্রকাশের জন্য এবং আমাকে সম্মান জানানোর জন্য। বন্ধু জুলাই আন্দোলনের আরেক যোদ্ধা। বন্ধুকে সংগ্রামী আলিঙ্গন। বিশেষ কৃতজ্ঞতা বুনন প্রকাশনীর কর্ণধার কবি খালেদ উদ-দীন ভাইকে। বই জার্নির সময়ে উনার মূল্যবান পরামর্শ আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে।

তারুণ্যের কণ্ঠস্বর এবং হক ও বাতিলের পার্থক্যকারী, আজকের বাংলাদেশের সবচেয়ে পাঠকপ্রিয় লেখক আরিফ আজাদ ভাইয়ের প্রতিও কৃতজ্ঞতা। গল্পপাঠ ও প্রতিক্রিয়া জানিয়ে তিনি আমাকে নিঃসন্দেহে আন্দোলিত করেছেন। *ঝরা ফুলের সৌরভ* বই হয়ে ওঠার সামনে পেছনে যাঁরা ছিলেন, প্রি-প্রোডাকশন ও পোস্ট-প্রোডাকশনসহ প্রত্যেক শব্দকর্মীর প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

আমার সহধর্মিণীর প্রতিও কৃতজ্ঞতা। বাসা শান্তির জায়গা না হলে কোনো কাজই শৈল্পিক সৌন্দর্যে উত্তীর্ণ হয় না। আন্দোলনের সময় আমার বড় বোন মাকসুদা চৌধুরী হাসপাতালে ছিলেন। দীর্ঘ ছয় থেকে সাত মাস ক্যান্সারের সাথে যুদ্ধ করে গত ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪-এ উনি মৃত্যুবরণ করেন। প্রিয়রা দোয়া করবেন আল্লাহ তায়ালা যেন উনার প্রতি সহায় হন।

আন্দোলনকারীদের জন্যই এ বই। আন্দোলনে যাঁরা পঙ্গুত্ববরণ করেছেন এ রাষ্ট্রের নৈতিক দায়িত্ব তাঁদের দায়িত্ব নেওয়া। আন্দোলনে যাঁরা শহিদ হয়েছেন তাঁদের আত্মত্যাগের ঋণ আমরা কখনোই শোধ করতে পারব না। মানুষ সত্য ও সুন্দরকে ভালোবেসে ন্যায়ের পথে

হাসিমুখে জীবন দিতে পারেন, নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও অস্ত্রের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেন এ ত্যাগ তো সহজ কোনো বিষয় না। এ ত্যাগ কতটা কঠিন তিনিই বুঝেছেন যিনি মৃত্যুকে বরণ করেছেন এক পৃথিবী ভালোবাসা উপেক্ষা করে। এবং যাঁরা স্বচক্ষে দেখছেন শহিদি ভাইয়ের নির্মম মৃত্যুর ছবি। শহিদ ভাইদের প্রতি ভালোবাসা। প্রেম ও প্রার্থনায় তাঁরা আমাদের মাঝে অমর হয়ে থাকবেন।

শেষে এসে সৌন্দর্য স্মরণ করা কর্তব্য। প্রিয় নবি হজরত মুহাম্মদ (স.)-এর প্রতি সশ্রদ্ধ সালাম। মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা—তিনিই তো সর্বজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান।

মৃত্যুঞ্জয়

[১]

যাঁর মন অবরুদ্ধ নয়, যাঁর হৃদয় অবারিত, তিনি কীভাবে পারেন শরীর আবদ্ধ রাখতে? মুক্তপ্রাণ পা দুটো নিয়ে একছুটে চলে যাওয়া যায় বিজয় মিছিলে—আগামীর বসন্তে। কিন্তু অপার রহস্যময় এ জীবন। রহস্যের অতলতা আবার গুপ্ত। সেই জীবনছবির চরিত্র হয়ে মাসুম মিয়া আজ অসহায়। গুলিবিদ্ধ শরীর নিয়ে লুটিয়ে পড়েছেন মৃত্যুর পথে। ঠিকানা কি অজানা এক স্টেশন?

মাসুমের সচকিত চাহনি। শত কোলাহলের ভেতর নীরব নিস্তব্ধ শরীর নিয়ে শুয়ে থাকা। দূরের সূর্য সংলগ্ন পথে মিছিলের উচ্চকিত ধ্বনি। আর এখানে মুহুর্মুহু গুলির শব্দ। শব্দে কী ভেদাভেদ, দৃশ্য থেকে দৃশ্যাতীত হয়ে যাচ্ছে মাসুমের চোখে, মাসুমের পৃথিবীতে। প্রায় দেড়শো ছররা গুলি লেগেছে মাসুমের শরীরে। গুলিগুলো রক্ত বের করে গুপ্ত ঘাতকের মতো চামড়ার ভেতর লুকিয়ে আছে। গুলিবিদ্ধ শরীর নিয়ে লুটিয়ে পড়ার কথাই শুধু মনে আছে তাঁর। কতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন বুঝতে পারছেন না। জ্ঞান ফিরে এলে মাসুম দেখেন লাশের স্তূপে রক্তাক্ত শরীর।

আপন রক্তাক্ত শরীর, অথচ শুধুই অনুভব করার মতো। দেখতে পারছেন না দৃষ্টি মেলে। আন্দোলনের কোনো এক ভাই, একজন

সহযোদ্ধা, তাঁর শরীরের অর্ধেক ঢেকে রেখেছেন। বাকি অর্ধেক আরও তিন-চার জন। কী ভয়ংকর দৃশ্য! নড়তে পারছেন না মাসুম একটুও। লাশের ভারেই কি অবশ হয়ে পড়ে থাকা? ভেতরে ভেতরে ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে শরীর। মৃত্যু কি খুব নিকটে! পৃথিবীর এ আলো কি নিমিষেই অন্ধকার হয়ে যাবে? শুভ্র আকাশ একমুহূর্তেই মিলিয়ে যাবে অমানিশায়? সূর্যের প্রখর আলো ঔজ্জ্বল্য ছড়াবে না এ দেহে? বাইরে রক্তভেজা শরীর উষ্ণ থেকে উষ্ণতর হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে।

মাসুমের বুঝতে আর বাকি রইল না তাঁকে মৃত ভেবেই লাশের স্তূপে ছুড়ে ফেলেছে পুলিশ। কী এক বিভীষিকাময় মুহূর্ত। ভ্যানের মধ্যে আনুমানিক বিশ থেকে পঁচিশটা লাশ। পুলিশ এখন কী করবে লাশগুলো নিয়ে? মাসুম বেঁচে আছে জানলে কি তাঁকে ছেড়ে দিবে নাকি মৃত্যু নিশ্চিত করতে আবারও গুলি চালাবে? কিছুই ভাবতে পারছেন না আর। ভয়ে শরীরে কাঁপন শুরু হলো। ঘেমে ভিজে যাচ্ছে শরীর। রক্তে ঘামে একাকার হয়ে যাচ্ছে মৃত্যুভয়। মাসুমের কানে এলো একজন পুলিশের নির্দয় কণ্ঠ। বলল,

'স্যার, আগুন দিয়া পুইড়া লামু লাশগুলা?'

অফিসার বলল, 'একটু পর পুড়ুম। আর কয়টা জমুক।'

আঁতকে ওঠেন মাসুম। ভেতরটা কী রকম রক্তশূন্য হয়ে যায়। কালেমা পড়তে থাকেন বারবার। মৃত্যুর আগে কালেমা পড়তে পারা ভাগ্যের ব্যাপার। মাসুম চেতনালুপ্ত হননি বুঝতে পারছেন। মাসুম কি শহিদ হবেন? এ চাওয়াই তো আকাঙ্ক্ষিত ছিল এত দিন। আর কয়েকটা গুলির অপেক্ষা নাকি জ্যান্ত পুড়তে হবে লাশের মিছিলে? কিন্তু মৃত্যুর এ আয়োজন মাসুম মেনে নিতে পারছেন না। আগুনে পুড়ে মরার চেয়ে চিৎকার করে গুলি খেয়ে মরা শ্রেয়। অথচ বাঁচার জন্য কী অদম্য স্পৃহা তাঁর ভেতরে কাজ করছে। মানুষ কি মৃত্যুমুখে জীবনকে ভালোবাসে সবচেয়ে বেশি? জীবনকে ভালোবেসে মাসুমের ভেতরে দুর্দমনীয় সেই চাওয়াই কাজ করছে।

নাফিসাচরিত

[১]

মেয়েবেলার নাফিসা রং নিয়ে খেলতে ভালোবাসতেন। একটা সময় পর্যন্ত এ খেলাই ছিল তাঁর জীবন। নাফিসার প্রিয় রং নীল। শিশুবয়সে অনুকরণপ্রিয় নাফিসার এ পছন্দ মায়ের কাছ থেকে পাওয়া। মা প্রায়ই একগাল হেসে বলতেন, 'তুই আমার বেদনার ফুল। আমাদের অন্ধকার সময়ে তুই আলো হয়ে এসেছিস। তুই আমার নীল অপরাজিতা।'

নাফিসা তখন মায়ের রহস্যময় কথা বুঝতেন না। শুধু বুঝতেন নীল রং মায়ের ভীষণ পছন্দ। টুকটুকে লাল নয়, উজ্জ্বল সাদা নয়, স্বপ্নের মতো রঙিন রং-ও প্রিয় নয় মায়ের। মাকে ভালোবেসেও, মায়ের ভাবনার বাইরে এসে যাপিত জীবনকে সঙ্গ দেওয়া নাফিসা ধীরে ধীরে বুঝতে পারেন, কখনো কখনো আলোর চেয়ে অন্ধকার সুন্দর, আনন্দের চেয়ে বেদনা, জীবনের চেয়ে মৃত্যু। তাই নীলও সুন্দর হতে পারে উজ্জ্বল সাদার পাশে।

নাফিসা মায়ের চোখে পৃথিবী দেখতে শুরু করলেও ধীরে ধীরে তাঁর চোখেও আলাদা একটা জগৎ তৈরি হয়। এ জগতেও নিজস্বতা গড়ে ওঠে। নাফিসার জগতে সত্যই সুন্দর এবং মিথ্যা অসুন্দর। আদর্শিক জীবনই পরিপূর্ণ সরল পথ। স্কুলজীবনে নাফিসার প্রতিযোগিতা ভালো লাগত খুব, উপভোগও করতেন। কিন্তু বৈষম্য একেবারেই সহ্যও

করতে পারতেন না। স্কুলের একটা ঘটনায় নাফিসা প্রায়ই ব্যথিত হন। স্কুল বিতর্ক প্রতিযোগিতায় জেলা পর্যায়ে অংশগ্রহণে নাফিসা আর শেফালি ভালো করলেও স্কুল কমিটির সভাপতির নির্বাচিত দুই মেয়ে অংশগ্রহণ করে। স্কুলের মতো আদর্শিক প্রতিষ্ঠানেও বৈষম্য চলে, এ বিষয়টায় নাফিসা খুব ব্যথিত হয়েছিলেন।

তবু নাফিসার কাছে জীবন সুন্দর। মানুষ সুন্দর। নাফিসার বিশ্বাস, কিছু অসুন্দর মানুষ তাঁর ভালো লাগাকে আটকে রাখতে পারবে না। প্রকৃতি নাফিসাকে এত এত সঙ্গ দেয় যে, বিষণ্নতা মনকে খুব বেশি ঘায়েল করতে পারে না।

শিশু বয়সে দোলনায় দোল খেতে নাফিসার খুব ভালো লাগত। তখন পুরো পৃথিবীটাই যেন এক দিক থেকে অন্য দিকে সরে যেত। কী রোমাঞ্চকর একটি পৃথিবী ছিল তখন! এ সময়ে এসে নাফিসার প্রথম পছন্দ গোধূলি লগ্ন। সূর্য যখন বাড়ি যায় নাফিসার মনে হয় সূর্যকে বিদায় দেওয়া উচিত। দেখতে চান, রক্তিম সূর্যটা কীভাবে মিশে প্রকৃতির গভীরে। নাফিসার ভালো লাগে বিচিত্র সব গাছ। সবচেয়ে প্রিয় নীল অপরাজিতা। নাফিসা প্রতিদিন কথা বলতেন নীল ফুলের সাথে। আনন্দের কথা, অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তির কথা, এমনকি বেদনার কথাও। ফুলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাবার সময় নিয়ে যান স্পর্শ। ঘ্রাণহীন নীলকণ্ঠ কী এক অপরূপায়, মিষ্টি শোভায় নাফিসার ভেতরটাকেই স্নিগ্ধময় করে তুলে।

নাফিসা আত্মপ্রত্যয়ী হলেও সহনশীল মেয়ে। স্কুল বান্ধবীদের সাথে ছিল নাফিসার প্রীতির বন্ধন। স্বার্থত্যাগ করে যে গ্রহণ করতে পারে সে কখনো কারও অপ্রিয় হয় না। মানুষ শুধু নয়, প্রকৃতির সাথে, এমনকি বাড়ির পোষা বেড়ালও নাফিসার বন্ধু। এরকমই নাফিসার জীবন। জীবনের এ সময়ে একটা আন্দোলন নাফিসাকে আরও বেশি দায়িত্বশীল করে তুলেন।